



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 481 - 488

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নগর কলকাতা-সহ চারপাশের সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের চিত্র : রমাপদ চৌধুরীর ‘খারিজ’ ও ‘লজ্জা’ উপন্যাস

পল্লবী শীল

গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: pallabisil92@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Self-centredness,
narrow
mindedness,
'status'
preference, class
consciousness,
unemployment,
inflation,
nuclear family
formation, child
labour,
degradation of
values, bribery.

Abstract

Ramapada Chowdhury was a 20th-21st century literary artist. The period of his writings was from the second half of the 20th century to the first decade of the 21st century. So he can be called the writer of two centuries. Stories, novels, essays, travel literature are his writings. However, the rest of the genres like the practice of short stories and novels do not shed light in that way. He has made life experience the subject of his stories and novels. As he did not have to resort to imagination, the stories became much more vivid and realistic. Ramapada Chowdhury has mainly highlighted the Second World War and its aftermath as a background in thinking about the subject of novels and short stories. Ramapada Chowdhury is a witness of how the environment of Kolkata including the city started to change due to the terrible impact of the Second World War. He joined the Presidency College in Calcutta during the war situation and started living in the hostel there. So he could easily see how the society of Calcutta and its surroundings started to change after the Second World War and its aftermath. The breakdown of financial infrastructure is largely responsible for this change. Scarcity, famine, inflation, unemployment make people self-centered and narrow minded. The common Bengali suffering from insecurity cannot think of anything but his own piece. A family of only three was formed with parents and only one child. On the other hand, the tendency to show 'status' increases. In order to maintain their class in the society, the abnormal girl of her house is brought to a psychiatric hospital, so that the society, as well as neighbours, relatives do not have to fall into any disrepute. Do not be disrespectful to people. It becomes more important to maintain the family honor properly in the people's society than the health of their daughter. All these social and emotional changes will be discussed through Ramapada Chowdhury's two novels 'Kharij' and 'Lajja'.

Discussion

রমাপদ চৌধুরীর রচনায় সময়কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সময়ের বাস্তব রূপ যেমন তাঁর উপন্যাস সমূহের মধ্যে চোখে পড়ে, তেমনি গল্পসমূহের মধ্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্য পথে যাত্রা শুরু হলেও উপন্যাস দিয়ে সেই পথের সমাপ্তি একথা বলা যেতে পারে। যাই হোক, সময়কে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস গুলোয় মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, মন্বন্তর প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে পটভূমি রূপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজ যত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে ততই মানুষের মধ্যে প্রকট হয়েছে ‘স্ট্যাটাস’ দেখানোর প্রবণতা। মানুষের মন সাংঘাতিক রকম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। নিজের টুকু ছাড়া যেন সে কিছুই ভাবতে পারেনা বা চায় না। নিজেদের ‘স্ট্যাটাস’ বজায় রাখতে সব সময় মধ্যবিত্ত বাঙালি চায় তাদের দুর্বল জায়গাগুলোকে সমাজের নজর এড়িয়ে রাখতে। কখনও বা অন্যায়কে টাকা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়। এই সমস্ত তৎকালীন সময়ের ঘটনাবলী রমাপদ চৌধুরীর ‘খারিজ’ ও ‘লজ্জা’ উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করা যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। এর ফলে সেই সময় একশ্রেণীর মানুষ প্রবল অর্থের বলে বলিয়ান হয়ে ওঠে। যাদের উচ্চমধ্যবিত্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। আর এক শ্রেণীর মানুষ কোন সাহেব কোম্পানিতে কাজ করে অথবা কোথাও অল্পস্বল্প মাইনের চাকরি করে দিনযাপন করে। এদের নিম্নমধ্যবিত্ত আখ্যা দেওয়া যায়। আবার অন্য আরেকটি শ্রেণি শুধুমাত্র দু-বেলা দু’মুঠো খেতে পাবার জন্য লড়াই করে চলে প্রতিনিয়ত। যাদের আমরা নিচু তলার মানুষ তথা নিম্নবিত্ত বলে মনে করে থাকি। উক্ত উপন্যাসে নগর কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকে এবং তার সঙ্গে এই সমাজকে পোস্টমর্টেম করে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করে তুলে ধরেছে সংকীর্ণ অমানবিক মনোভাব, সমাজ কত নৃশংস, মানুষ কিভাবে তার অপরাধ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে সেই সমস্ত চিত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন এই মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের একশ্রেণির মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে মন অনুদার, আত্মসুখ পরায়ণ, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে দেখা যায়। তারা তাদের সুখের জগতটিকে পরিমিত, সীমিত করে নেয়। তেমনই আর একশ্রেণি চেয়েছে অর্থের জোরে আরো বৃহৎ, আরো ক্ষমতাসালী হয়ে উঠতে। সমস্ত কিছু তারা একাই ভোগ বা গ্রাস করতে চায়। এদের মধ্যেও প্রবল আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব। যেমন জয়দীপদের বাড়িওয়ালা নটবর রায় তারই দৃষ্টান্ত -

“এই জল নিয়ে বাড়িওয়ালায় সঙ্গে ঝগড়া। ওঁর ওদিকে একটা বড় চৌবাচ্চা আছে, সেটা ভর্তি হয়ে জল উপচে পড়ে যাবে, তবু কল বন্ধ করবেন না ভদ্রলোক। অথচ ঐ কলটা বন্ধ না করলে আমাদের এপাশে জল আসে চুরচুর করে, বালতি ভর্তি হতে আধ ঘন্টা। দোতলায় ওঁর চক্ৰিশ ঘন্টা পাম্পের জল, তবু আমাদের বাঁধা সময়ের কর্পোরেশনের জলেও ভাগ বসানো চাই। এটুকুই ওঁর বিলাস।”

অর্থ, সম্পত্তি-প্রতিপত্তির জোরে নিজের দোষকে চাপা দিতে চায় সে। ভেন্টিলেটরহীন রান্নাঘরের প্রসঙ্গ করোনার কোর্টে যাতে না ওঠে এবং পালানের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ম্যানেজ করবার জন্য জয়দীপকে সে টাকা ঘুষ দেবার কথাও বলে। রায়বাবু মনে করেন সমস্ত সমস্যার টাকা দিয়ে সমাধান করা যায়।

সেই সময় বড় বড় একাল্লবর্তী পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার তৈরি হয়। যে পরিবারে কেবল বাবা-মা এবং তাদের সন্তান থাকে। ‘খারিজ’ উপন্যাসেও তেমন জয়দীপ-অদিতি আর তাদের একমাত্র সন্তান টুকাইকে নিয়ে একটি ছোট সংসারের কাহিনি। টানাটানির সংসারে জয়দীপরা ব্যর্থ নিজের সন্তানের সঙ্গে অন্য কারও সন্তানকে সমান চোখে দেখতে। তাদের বাড়িতে আশ্রিত বাচ্চা চাকর পালান প্রচণ্ড শীতের রাতে তাকে রান্নাঘরে শুতে হয়। শীত প্রতিরোধক হিসেবে একটি শতরঞ্জির মতো তোষক আর ছেঁড়া চাদর। যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত পালানের মৃত্যু ঘটে। জয়দীপদের অবহেলিত মন এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। তারা শুধু নিজের সন্তানের সঙ্গে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করেছে। চাকর হলেও সে যে একটা বারো বছরের বাচ্চা একথা তারা বিস্মৃত হয়। সংকীর্ণ, স্বার্থপর মনোভাবের বশে জয়দীপ চায় পালানের মৃত্যুর

দায়ভার অন্যের কাঁধে চাপাতে। সে একবার বাড়িওয়ালা, কখনো পালানের বাবা আবার কখনো স্ত্রী অদিতিকে দোষারোপ করে -

“...তেলচিটে তুলো বেরোনো তোষকটা ব্যবহারে ব্যবহারে শতরঞ্জির মত পাতলা হয়ে গেছে। বালিশটায় দুর্গন্ধ। অথচ কোনদিন ওদিকে আমার চোখ যায়নি। যাবার কথাও না। এসব তো অদিতির এলাকা। ও কেন দেখেনি। আজ সেজন্যেই তো বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ হতে হল।...”^২

জয়দীপ নিজের দিকে তাকিয়ে তার দোষের বিচার করে না। আর এটাই বদলে যাওয়া মধ্যবিভূতের আসল রূপ। যেখানে মানুষ তার নিজের দোষটা আগে না দেখে অন্যের ভুল-ত্রুটি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঋতংকর মুখোপাধ্যায়ের কথায়-

“খারিজকে আমরা বলতে পারি সদাশিক্ষিত নাগরিক যাপনের গল্প, আপাত - নিরুদ্ভিগ্ন জীবনের সন্ধানে মানুষের ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার গল্প, মূল্যবোধ শূন্য মধ্যবিভূতের আত্মবীক্ষণের গল্প। সেই নাগরিকসত্তা বার বার অনুভব করে চারপাশের মানুষজন খুব দ্রুত নিজেদের বদলে ফেলেছে; বদলে যাচ্ছে সে নিজেও, — দয়া, প্রেম, স্নেহ, মমতা সব হারিয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র আত্মসুখের মোহে সে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে পড়ছে।...”^৩

বাড়িওয়ালা নটবর রায়ের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করে যাতে করোনার কোর্টের ঝামেলা থেকে তারা নিষ্কৃতি পেতে পারে। প্রতিবেশি শিবশঙ্করবাবুকে এমনিতে ভালো মানুষ মনে হলেও পালানের বাবাকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসায় জয়দীপের কাছে সে শত্রুতে পরিণত হয়। অদিতি মাতৃস্নেহদ্বারা বর্ষণের বদলে মাতৃস্নেহ সীমিত করে। শুধু নিজের সন্তানের সুখ-দুঃখের কথাই সে চিন্তা করেছে। পালানের কষ্টের কথা সে ভাবতে ব্যর্থ। এখানে মাতৃহৃদয়ের সংকুচিত রূপ চোখে পড়ে।

সেই সময় উচ্চমধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে ক্ষমতার অপপ্রয়োগও লক্ষ্য করার মত। জয়দীপের বন্ধু অভিজিতের অমানুষিক আচরণে তা স্পষ্ট। বাড়ি ফিরে গৃহভৃত্যকে দিয়ে পায়ের জুতো খোলানো অবশ্যই একটি ঘৃণ্য কাজ। তার স্ত্রী নিষেধ করলেও এই কাজকে সে সঠিক বলে মনে করে -

“...একজন পরিচ্ছন্ন পোশাকের চাকর ছুটে এসে ওর পায়ের সামনে উবু হয়ে বসলো। কাঁধে ঝাড়ন ঐ চাকরগুলোকে বোধহয় বেয়ারা বলে। সে চুপচাপ অভিজিতের জুতোর ফিতে খুলে দিলো, আলতোভাবে পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিলো।”^৪

এখানে মনুষ্যত্বের বিলোপ দেখা যায়। সমাজের এই নীচু তলার মানুষজন অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে দিনযাপন করে। এদের প্রতি উঁচুতলার মানুষদের সহানুভূতির দৃষ্টিটুকুও পড়ে না। বরং ক্ষমতার বলে বলিয়ান লোকেরা চেষ্টা করে এদের আরো কি করে নিচে নামিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়। হারান সংসারের কল্যাণে তার একমাত্র পুত্রকে কলকাতায় কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। সংসারে পাঁচজন মানুষের মুখে দু-বেলা দুমুঠো অল্প যোগানোর ভরসায় কুড়ি টাকায় রফা করে ছেলেকে জয়দীপদের বাড়িতে রেখে যায়। অত্যন্ত দায়ে না পড়লে কেউ বারো বছর বয়সি একজন বাচ্চা ছেলেকে অন্যের বাড়ি কাজ করতে পাঠাতে পারে না। অথচ পালানের মৃত্যুতে জয়দীপ মনে মনে হারান কেউ দোষারোপ করে -

“...আমি তো আমার প্রয়োজনের জন্যে একটা বালক ভৃত্য চেয়েছিলাম। কিন্তু বুড়োটাই তো আসলে দায়ী, মাসের মাস কুড়িটা টাকার লোভে সে কি বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে যায়নি? জিলিপি খাইয়ে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেনি? ...”^৫

সহায় সম্বলহীন এই সমস্ত মানুষদের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাবও ফুটে উঠতে দেখা যায়। পালানের অচৈতন্য অবস্থা দেখে জয়দীপ ডাক্তার বাগচিকে ডেকে আনতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কার অসুখ। পালানের অবস্থার কথা শুনে ডাক্তার বাগচি ‘চাকরটা’ বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করেন। যেন ভৃত্যের কাজ করে বলে তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। নিম্নবিত্ত বলেই পালানের বৃদ্ধ পিতা হারানকে একরকম কৌশল করে দমিয়ে রাখা হয়। যাতে সে না কোনো কোর্টের কাজে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গ্রামের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। পালান নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে বলেই তার মৃত্যুর তদন্ত সেভাবে হয় না। তার মৃত্যুকে একটা সাধারণ মৃত্যু বলে ছেড়ে

দেওয়া হয়। এখানে বাড়িওয়ালা কেন রান্নাঘরে ভেন্টিলেটর রাখেনি, জয়দীপ-অদিতি নিজের সন্তানের সঙ্গে আর একটি বাচ্চাকে সমদৃষ্টিতে কিসের জন্য দেখতে ব্যর্থ এইসবের তদন্ত সেখানে হয়নি। আজকে পালানের পরিবর্তে কোন নামী খ্যাতনামা ব্যক্তির এইভাবে মৃত্যু ঘটলে তবে তার জল বহুদূর গড়াতো। আমাদের এইরূপ গড়ে ওঠা সামাজিক পরিকাঠামো অত্যন্ত সমালোচনার বিষয়।

তৎকালীন সময়ে ঘুষ নেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। যে ঘুষ নেয় সেই একমাত্র দক্ষ, অভিজ্ঞ কর্মচারী। উক্ত উপন্যাসে ঘোষসাহেব চরিত্রটি সেরকম একটা দৃষ্টান্ত। জয়দীপের দৃষ্টিতে –

“...শালা নতুন এসেছে, সঙ্কলের পিছনে লাগছে। অথচ কাজ কিচ্ছু জানে না। শুধু ছুরি আর কাঁটাচামচ ধরতে শিখে এসেছে। দেদার ঘুষ খাচ্ছে। আজকাল অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে— যে ঘুষ খায় সেই এফিসিয়েন্ট। ...”^৬

উক্ত উপন্যাসে শিশুদেরকে দিয়ে বাড়ির কাজ করানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কাজের লোক বাচ্চা হলেই যেন ভালো হয়। কারণ শিশুরা অত্যন্ত সরল, প্রাণবন্ত এবং সাদাসিধে হয়। ওদেরকে যেকোনো কাজই বলা হোক না কেন সে কাজ তারা হাসিমুখে করে দেয়। তৎকালীন বঙ্গসমাজে শিশুদেরকে দিয়ে বেগার খাটানোর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় উক্ত উপন্যাসে-

“...একটা লোক দেখে দিন না, কাজের লোক, একটু বাচ্চা দেখে। আসলে বাচ্চাগুলো খুব চটপটে হয়, ফাইফরমাশ করা যায় তাদের, মুখে হাসি লেগে থাকে।”^৭

বারো বছর বয়সি শিশু পালান পেটের দায়ে পরের বাড়ি কাজ করতে আসে। যে বয়সে তার স্কুলে পড়াশোনা করবার কথা সেই বয়সে সে অন্যের বাড়িতে দাসত্ব করে বেড়ায়। আর তাতেই সে খুশি। টুকাইকে রাস্তার মোড়ে স্কুলব্যাগ কাঁধে করে পৌঁছে দিয়ে আসাতেই তার আনন্দ। শুধু পালান নয়, পালানের মতো আরও অনেক শিশুই অর্থের প্রয়োজনে চাকরের কাজ করে। যেমন এই উপন্যাসে বর্ণিত হরি, রামু, গণেশ, সিধু, বিশ্বনাথ এরা প্রত্যেকে বাচ্চা চাকর। অল্প বয়সে টাকা রোজগার করতে নামলে তার খারাপ দিকও রয়েছে। অসৎ পথে যাবার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। অদিতিদের বাড়ির পূর্বের চাকর বিশ্বনাথ এমনই কিছু দৃষ্টান্ত রেখে দিয়ে যায় –

“পালান ছেলেটাই প্রথম নয়। তারও আগে তিন-চারটে এসেছে গেছে। রামু, বিশ্বনাথ। তখন টুকাই বোধহয় দু'বছরের। তখন আমাদের নতুন সংসার, এত তিজবিরক্ত হয়ে উঠতাম না। না আমি, না অদিতি। ঐ আলমারী বাক্স মালপত্রে ঠাসা বসার ঘরখানায় ওদের শুতে দেওয়া হত। তখনো আমরা সংসারে কিছুটা অনভিজ্ঞ, তখনো আমাদের শরীরে মায়াদয়া ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথই বোধ হয় প্রথম সেটুকু কেড়ে নিয়ে চলে গেল। রাতে কখন আলমারীর তলা ভেঙে জামাকাপড় ঘড়ি আংটি নিয়ে পালালো। সামান্য কিছু টাকাও। ...”^৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়। সাধারণ মানুষের কেনবার ক্ষমতা যত কমে, জিনিসপত্রের দাম ততই অগ্নিসম হয়ে ওঠে এবং দাম বাড়লেও জিনিসের গুণগত মান যথেষ্ট কম –

“... বাজারে যেতে দেরি হয়ে গেলে তখন আর ভাল মাছ পাওয়া যায় না। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, মানুষের যত অভাব বাড়ছে, জিনিসপত্রের অভাবও ততই বাড়ছে। একটু দেরিতে গেলে বাজার খাঁ খাঁ করে। ...”^৯

উক্ত উপন্যাসে তৎকালীন সময়ে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে। এছাড়া তৎকালীন সমাজে শিক্ষা, আইন তেমন কঠোর ছিল না বলেই বারো বছর বয়সী বা তার কম বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে রোজগারের কাজে ভিড়তে দেখা যায়। ১৯৮৬ সাল থেকে চোদ্দো বছর বয়সী শিশু বা তার নিচে কম বয়সী শিশুদের দিয়ে বেগার খাটানো আইনত অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু তার আগে এই আইনি ব্যবস্থা ছিল না। নিম্নবিত্ত মানুষদের ঘরে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম ছিল, কারণ তারা পেটের দায়ে টাকা রোজগার করার পথে নেমে পড়ত। স্কুলে যাবার অবসর তাদের ছিল না। পালান চরিত্রটি তার যথাযোগ্য উদাহরণ।

এই উপন্যাসটিতে উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মিল উভয়ই দেখা যায়। পূর্বে দ্বন্দ্ব থাকলেও স্বার্থের কারণে পরে তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তের কাছে নেমে এসে হাত মেলায়। কারণ তখন তাদের দু'জনের উদ্দেশ্যই এক, দু'জনের স্বার্থ এক। বাড়িওয়ালা নটবর ও ভাড়াটে জয়দীপের মধ্যে যতই কলহ, বিবাদ হোক না কেন, পালানের মৃত্যু তাদের এক শ্রেণিভুক্ত করে দেয় –

“রায়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে এসব তো বানানো পরিচয় মশাই, আসলে আমরা তো একই ক্লাশ, একই সমাজের লোক, তাই নয়?”^{১০}

জল সংক্রান্ত বিবাদ ঝগড়া ভুলে জয়দীপও রায়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে উপরে চলে যায়। তাদের এই মিলের কারণ হল পালানের মৃত্যুর কেস থেকে তারা যাতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসতে পারে –

“রায়বাবু এবার গলার স্বর নামালেন। বললেন, করোনারের রিপোর্ট যাতে আমাদের দু'জনের কারো বিরুদ্ধে না যায়, আমরা কেউই যাতে ঝামেলায় না পড়ি, সেটা তো দেখতে হবে। আপনার বিপদে যদি আমি না পাশে দাঁড়াই, আমার বিপদে যদি আপনি না দাঁড়ান, তা হলে তো কেউই বাঁচবো না।”^{১১}

আমাদের এই সমাজ, সমাজের মধ্যে থাকা মানুষজন তাদের মনোভাব বর্তমান সময়ে যে কত সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরায়ণ হয়ে গেছে তা এই উপন্যাসটি পাঠ করলে অনায়াসে বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নগর কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের, তাদের মনোভাবের বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে সমাজ সংকীর্ণ হয়েছে, মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বই যে একমাত্র ধর্ম তা মানব সম্প্রদায় বিস্মৃত হয়েছে। অর্থের অনুপাতে শ্রেণী বা ক্লাস বিচার করে মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়। আবার স্বার্থের প্রয়োজনে অর্থের জোরে গড়ে তোলা ক্লাস ভুলে ওপরতলার মানুষজন নিচু তলার মানুষের সঙ্গে হাত মেলায়। সমকালীন সময়ের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের বিলোপ, শিশুশ্রম, মূল্যবৃদ্ধির মত বিষয়গুলো স্বর রূপে উক্ত উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

অন্যদিকে ‘লজ্জা’ উপন্যাসেও দেখা যায় মনুষ্যত্বের বিলোপ, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মত চিত্র। উনিশশো পঁচাত্তর সালে প্রকাশ পাওয়া এই উপন্যাসে রেণুকে ঘিরে সমগ্র কাহিনি আবর্তিত হয়। ঘটনার মূল বক্তা অনিমেস। পড়াশোনার সুবিধার্থে কলকাতায় দূরসম্পর্কের এক পিসীমার বাড়ি থাকা। বাণীপিসীমার বড় মেয়ে রেণু অনিমেসের সমবয়সি হওয়ায় তারা একে অপরের বেশ ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। চলে গল্প, খুনসুটি, আড্ডা। যেমন রেণুর সকালে কলেজ থাকায় প্রত্যহ ভোরে অনিমেসের ঘরে টোকা দিয়ে তবে বাড়ি থেকে বের হত। প্রথমদিকে অনিমেস বুঝতে না পারলেও পরে দেখে এই কাজ রেণুর। অনিমেসের জবানীতে –

“... বিয়ের আগে ওর ছিল মর্নিং কলেজ। খুব সন্ধ্যাে উঠে নিজেই চা বানিয়ে খেয়ে কলেজ চলে যেত। বেশির ভাগ দিন কখন ফিরতো, আমি টেরও পেতাম না। কারণ আমার কলেজটা ছিল বেশ দূরে, ও ফিরে আসার অনেক আগেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হত। কোন কোনদিন ও তাই দুট্টমি করে ভোরবেলা বার কয়েক আমার ঘরের দরজার কড়া নেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত। আমি হুড়মুড় করে বিছানা থেকে উঠে কপাট খুলে দেখতাম, কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যাই তখন আধো ঘুমের মধ্যে। প্রথম দু'দিন আমি বুঝতেও পারিনি। তাছাড়া অত সকালে তখনো চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে, তাই আবার গিয়ে শুয়ে পড়তাম। হয়তো ভুল শুনেছি, আশেপাশে অন্য কোন দরজায় কেউ কড়া নেড়েছে। কিন্তু তারপর একদিন রেণু ধরা পড়ে গেল। আমি সেদিন কপাট না খুলে এপাশে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। রেণুও তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়েছে। চোখোচোখি হতেই হেসে ফেললে ও। ...”^{১২}

কলেজে পড়তে পড়তেই রেণুর বিয়ে হয়ে যায়। এই বিয়ের জন্য যদিও সে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তাই বিবাহের কিছুদিন পর থেকে শুরু হয় সমস্যা। রেণু মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এমন অনেক কান্ড ঘটতে থাকে যেটা থেকে তাকে একজন সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ বলা যায় না। স্বামী অরুণ তাকে পিতৃগৃহে রেখে যায়।

রেণুর বাবা-মা প্রথমদিকে অরুণের বলা কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও যত দিন যেতে থাকে রেণুর কার্যকলাপ প্রমাণ করে দেয় অরুণের বলা কথা সব সত্যি। অরুণ মনে করে -

“...রেণুর মধ্যে একটা স্ট্রীক অফ ইনস্যানিটি আছে।”^{১৩}

রেণু স্বাভাবিক থাকতে থাকতে কখনো আবার অস্বাভাবিক হয়ে উঠতো। কখনো সে জামাকাপড়ের আলমারির পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো তো কখনো তার বোন-ভাইদের চুলের ফিতে, বেল্ট, জামাকাপড় ইত্যাদি জিনিস লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। আবার কখনো একটা পুতুলকে নিয়ে আপন মনে তার সঙ্গে অনর্গল কথা, তাকে বউ সাজানো এইসব কাজ করতো। এই সময় তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা থাকে। রেণু সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। অনিমেষের বক্তব্যে -

“আর কারো সন্দেহ রইলো না। অবিশ্বাস করে যে বিপর্যয়কে দূরে সরিয়ে চোখের আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন পিসেমশাই আর বাণীপিসীমা, তা চোখের সামনে একটা বিশী চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল রেণু ক্রমশই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে।

ও এমন এক একটা কান্ড করে বসছিল যা প্রথম ছিল শুধু বিস্ময়। আমরা কেউই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ও কেন এ-সব করে বসছে। কেন তুচ্ছ সব জিনিস ও হঠাৎ লুকিয়ে রাখতে চায়। বাড়ির সব গোপন জায়গাগুলোর সঙ্গেই যেন ওর বন্ধুত্ব। কখনো আলমারির পিছনে, কিংবা আলমারির মাথায় টাঙানো ছবির আড়ালে, কয়লা রাখার জায়গায়, হঠাৎ টুকটাক কোন একটা জিনিস ও লুকিয়ে ফেলে। খুঁজে বের করে ফেললেই ওর চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। ওর মুখেচোখে যেন রক্ত ফেটে পড়ে, প্রাণপণ শক্তিতে সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। ...”^{১৪}

রেণুর এমত ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রেণুর বাবা-মা, ভাইবোন এমনকি তার স্বামী পর্যন্ত তাকে ক্রমশ বাইরের লোক করে দেয়। রেণুকে ভালোবেসে কাছে টেনে তার মনের দুঃখটা কোথায় সেটা জানবার পরিবর্তে তারা রেণুকে বকাবকিসহ নানাবিধ কথা বলে দূরে সরিয়ে দেয়। তার নোংরা, অপরিষ্কার হয়ে থাকাতে কেউ তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এমনকি অরুণও না। যে সময়ে রেণুর তার বাড়ির লোকের ও স্বামীর সহযোগিতা ভালোবাসা একান্ত প্রয়োজন সেই সময় তারা রেণুর এই অপ্রকৃতিস্থ রূপকে সহ্য করতে না পেরে তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে দিয়ে আসার কথা চিন্তা করে এবং ডাক্তার বোসের তত্ত্বাবধানে সেখানেই তাকে দিয়ে আসা হয়। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে একমাত্র খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায় সে অনিমেষকে। রেণুর ধারণা মনুদা কখনো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্যায় করবে না। শেষপর্যন্ত মনুই মানসিক হাসপাতালে রেণুকে ভর্তি করতে সাহায্য করে তার বাড়ির লোকদের। যেটা রেণুকে আরও আঘাত দেয়।

মনু চরিত্রটি প্রমাণ করেছে আমরা কেউই সমাজের উর্ধ্ব নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের ছোঁয়া তার গায়েও লেগেছে। তাই তো সে নিজের সম্মান বাঁচাতে রেণুকে পাগলা গারদে পৌঁছাতে সাহায্য করে। রেণুর এই অবস্থার জন্য সেই যে প্রকৃত দায়ী একথা কাউকে ঘুণাঙ্করে জানতে দেয় না। অন্যদিকে রেণুর এই পাগলামো আর সকলের সহ্য করতে না পারলেও মনু সবসময় রেণুর ওপর করুণ হয়েই থাকে। রেণুকে যখন কেউ কোন কটকথা বলেছে বা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তখন অনিমেষের মন দুঃখে জর্জরিত হয়েছে। তবু সাহস করে রেণুর জন্য কিছু করতে পারেনি। সবার আগে সে নিজের সম্মানের কথা ভেবে নেয়। পাছে তার রেণুর প্রতি গোপন ভালোবাসার কথা প্রকাশ না হয় সেই ভয়ে সবকিছু অমানবিক কার্যকলাপের সাক্ষী হয়েও নীরব থাকে। শম্পা চৌধুরীর কথায় -

“...রেণুর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে খুঁজতে এবং সেই বিপর্যয়ে অন্যদের দায়িত্ব অন্বেষণ করতে করতে অনিমেষ ক্রমশ এক ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বাণীপিসীমার বাড়িতে আসার পর থেকে ছোট বড় অনেক ঘটনার কথা অনিমেষ যখন আবার নতুন করে ভাবে তখন ভেতরে একটা ক্ষীণ অথচ ভয়ঙ্কর সন্দেহ তার মনে জেগে ওঠে। রেণুর জন্য তার নিজের উৎকণ্ঠাও তার কাছে আর নিছক

উৎকর্ষা থাকে না। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে অনিমেঘ যতই রহস্যের জট ছাড়াবার চেষ্টা করে ততই রেণুকে খুঁজতে গিয়ে সে নিজেই দেখতে পায়...।”^{১৫}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত সমাজের যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তা ‘লজ্জা’ উপন্যাস থেকেই বোঝা যায়। মধ্যবিত্তের জড়াজীর্ণ, সংকীর্ণ মন, শ্রেণী সচেতনতা এবং এর সঙ্গে রয়েছে আত্মগ্লানি - এইসবই তৎকালীন সময়ের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে লক্ষণীয়। রেণুর মানসিক ভারসাম্যহীনতায় তার বাবা মক্কেলদের সামনে লজ্জা পায়। তাই মক্কেলদের নিয়ে তিনি যখন আলোচনা করেন তখন রেণুর চেঁষারে যাওয়া নিষিদ্ধ। রেণুর মা মেয়ের এই অবস্থা পাশের বাড়ির মিত্তিরিগিনিসহ আরো সবার কাছ থেকে গোপন করতে চায়। কুমার বিয়ে উপলক্ষে কুমা এবং তার মা রেণুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করতে গেলে বাণীপিসিমা একরকম তাদেরকে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছে পাছে রেণুর পাগলামো তাদের চোখে না পড়ে। টুনটুন, বাবুল তাদের দিদির কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। রেণুর বাবাও তাকে কাছে যেতে দেয় না। রেণুর অপরিচ্ছন্ন বেশবাস দেখে সবাই তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমনকি স্বামী অরুণও। সমাজে এবং পাড়ার লোকদের নিকট নিজেদের সম্মানহানি যাতে না হয় সেজন্য রেণুকে তারা সবসময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অনিমেঘের কথায় -

“কে যেন একবার ব্যঙ্গ করে বলেছিল, ওরাই তো নরম্যাল, আমাদের এই সমাজে এত রকমের টানাপোড়েন, পাগল না হওয়াটাই তো অ্যাবনরমাল। কথাটা মিথ্যে নয়। কলেজের কমনরুমে, আপিসে আপিসে সবাই সমাজ বলতে, সমাজ ব্যবস্থা বলতে বোঝে শুধ টাকা-পয়সা। অথচ পিসেমশাইকে দ্যাখো, মুখে যাই বলুন, রেণুর জন্যে ওঁর নিশ্চয় প্রচণ্ড অশান্তি। তবু আমাকে সাবধান করতে ভোলেননি। কারণ একটা কিছু রটে গেলে টুনটুনের বিয়ে দিতে পারবেন না। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল এই পচাধসা সমাজটাকে উল্টে দিতে, যেমন করে লাঙলের ফলা মাটি উল্টে দেয়।”^{১৬}

রেণুর যথাযথ চিকিৎসার বদলে তাদের নিকট মানসম্মান বেশি বড় হয়ে ওঠে। রেণুর মা মেয়ের মরণ কামনা করেন। আর তার বাবা স্ত্রীকে বলেন -

“...তোমার মেয়ের জন্যে আমি আর কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না। ‘তোমার মেয়ে’।”^{১৭}

রেণুর যখন সবচেয়ে বেশি তার বাড়ির সদস্যদের এবং স্বামীর সাহচর্যের প্রয়োজন থাকে সেই সময় তারা রেণুকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাদের কাছে সে অসহ্যকর, অসহনীয় একজন মানুষ। অনিমেঘের কথায় -

“...পিসেমশাই বললেন, ওকে হাসপাতালে দেওয়াই ভাল। বাড়িতে রেখে নিয়মমত চিকিৎসা করানো অসুবিধে।

বাণীপিসিমা অবাক হয়ে বলে উঠলেন, হাসপাতালে?

পিসেমশাই চুপ করে থেকে বললেন, মানে, ঠিক অ্যাসাইলাম নয়। ডাক্তার বোসের একটা ছোটখাটো নার্সিং হোম গোছের...

বাণীপিসিমা কিছুর বললেন না। বুঝলেন কিনা জানি না। আমি বুঝতে পারলাম পিসেমশাই কি বলতে চাইছেন। উনি আসলে পাগলা-গারদ কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। পারছেন না। ভাগ্যিস উনি একটু ঘুরিয়ে বললেন। অরুণদা সেদিন ক্ষোভে কিংবা রাগে বলে উঠেছিল, পাগলা-গারদ। ...”^{১৮}

পাগলাগারদে রেণুকে ভর্তি করে দিয়ে আসবার সময় রেণুর ডাকে তারা বিরক্ত এবং লজ্জিত বোধ করে। কারণ পাশাপাশি লোকজন রেণুর বাড়ির লোক বলে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তাই। অনিমেঘও নিজের গোপন ভালবাসা কোনদিন প্রকাশ পেতে দেবে না বলে পাশও মনে রেণুকে অ্যাসাইলমে ভর্তি করতে যায়। মধ্যবিত্তের সবকিছুতেই যেন লজ্জা প্রকাশ পায়। সেটা মেয়ের রোগের ক্ষেত্রেই হোক বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত সর্বত্রই একটা ইতস্তত ভাব কাজ করে থাকে। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে কখনো স্বার্থপর, সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন হতে দেখা যায়।

উপরিউক্ত দুটো উপন্যাসেই বিংশ শতকের আশির দশকের সময় ও সমাজের চিত্র স্পষ্ট। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে সমকালীন মানবমনের বদল, তাদের হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যবোধ, অবক্ষয়িত সামাজিক রূপকে। যেখানে একজন শিশু তার বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার কোন বিচার পায়না। কোন প্রতিবাদ হয় না একজন বাচ্চা ছেলের শৈশব যার এবং যাদের জন্য বিসর্জন দিয়ে রোজগারের পথে নামতে বাধ্য হয়। কোন আন্দোলন হয় না জয়দীপ-নটবর রায়দের মতো স্বার্থপর-আত্মকেন্দ্রিক-সংকীর্ণ মানুষদের বিরুদ্ধে, যারা নিজেদের দোষ অন্যায় গাফিলতি ঢাকতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ও শেষে নির্দোষ প্রমাণ হয়। কোন ছিঃ ছিঃকার ওঠে না রেণুর বাবা-মা ও স্বামীর বিরুদ্ধে, যারা সমাজে নিজেদের ‘ক্লাস’ বজায় রাখতে অন্যায়সে তাদের কাছের মানুষকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠাতে পারে। সমাজ ও সময়ের এই বিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট উক্ত উপন্যাস দু’টোয়।

Reference:

১. চৌধুরী, রমাপদ, ‘খারিজ’, উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৫, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ২২
২. তদেব, পৃ. ১৮
৩. মুখোপাধ্যায়, ঋতংকর, ‘খারিজ পর্বের উপন্যাস : নাগরিক মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত সংকট’, পুরকাহিত উত্তম (সম্পাদনা), ‘রমাপদ চৌধুরী : বৈচিত্র ও অনুসন্ধান’, উজাগর প্রকাশন, শিবানন্দধাম সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন ৭১১৩১৫, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৩১-৩৩২
৪. চৌধুরী, রমাপদ, ‘খারিজ’, উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৫, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫১
৫. তদেব, পৃ. ৩০
৬. তদেব, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ২১
৮. তদেব, পৃ. ১৯
৯. তদেব, পৃ. ৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৮
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. চৌধুরী, রমাপদ, ‘লজ্জা’, উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৫, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭৭
১৩. তদেব, পৃ. ৮২
১৪. তদেব, পৃ. ৯৪
১৫. চৌধুরী, শম্পা, ‘রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প’, এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১২৪-২৫
১৬. চৌধুরী, রমাপদ, ‘লজ্জা’, উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৫, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৮৫
১৭. তদেব, পৃ. ১২২
১৮. তদেব, পৃ. ১২৪